ভাষা আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদান

চাঁদ সুলতানা কাওছার

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookChad

পূর্ববাংলার উচ্চশিক্ষার প্রথম পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজ (১৯৪৬)। এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার একবছর পরই (১৯৪৭) ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র আবির্ভূত হয়। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ববাংলা শুরু থেকেই নানারকম শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়। পাকিস্তান সরকার এই অঞ্চলের মাতৃভাষার ওপর প্রথম আঘাত আনে এবং প্রতিবাদস্বরূপ পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ আন্দোলন গড়ে তোলে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাহসী ও প্রতিবাদী ভূমিকা ছিল স্মরণীয়। তারা ১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে সুসংগঠিত হয়েছে এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। অথচ তাদের অবদানের কথা অনেকের কাছে অজানা এবং সার্বিকভাবেও স্বীকৃতি পায়নি। চিকিৎসাশিক্ষার শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকতে হয়। পড়াশোনার বাইরে অন্য কিছুতে সময় ব্যয় করা খুব কঠিন। তারপরও এ কলেজের শিক্ষার্থীরা দেশ ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থাকায় ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং অসামান্য ভূমিকা রাখে। আলোচ্য প্রবন্ধে ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন তথা ১৯৪৭, ১৯৪৮ এবং চূড়ান্ত-পর্ব তথা ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের রেয়ার সেকশন, জাতীয় গ্রন্থাগার ও বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস, ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরির বই, পত্রপত্রিকা ও সাক্ষাৎকার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

পূর্ববাংলার মানুষ দীর্ঘকাল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এ অঞ্চল বিদেশি শক্তি তথা ব্রাহ্মণ, তুর্কি, পাঠান, মোগল, ইংরেজ ও পাকিস্তানিদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়। বিদেশিদের দ্বারা শাসন ও শোষণের সাথে সাথে বিদেশি ভাষাও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রীয় ভাষা বা সরকারি ভাষা হিসেবে। এর ফলে দেশি ভাষা তেমন বিকাশের সুযোগ পায়নি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর দেশি ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদালাভের সুযোগ আসলেও বাংলাভাষা বঞ্চিত হয় (ইসলাম, ১৯৮৬, পৃ. ৯৯)। অবিভক্ত ভারতের মুসলমানগণ বিভিন্নভাষী ছিলেন। এর মধ্যে বাংলাভাষী মুসলমানের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি (ইসলাম, ১৯৮৬, পৃ. ৯৯)। ১৯২১ সালে সেন্সাস রিপোর্টে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২৩,৯৯৫,০০০ (ইসলাম, ১৯৮৬, পৃ. ৯৯)।

দেশবিভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তান বিভিন্নভাষী (পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পশতু, বালুচি, ব্রাহুই) এবং পূর্ব-পাকিস্তান বাংলাভাষা অধ্যুষিত অঞ্চল। এ সময়ে ভারত থেকে উর্দু ও অন্যভাষী মুসলমান ব্যাপক সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায় এবং স্বল্প-সংখ্যক পূর্ববাংলায় চলে আসে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে মোট ৬ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ছিল বাংলা ভাষাভাষী (ইসলাম, ১৯৮৬, পৃ. ৯৯)। সামগ্রিকভাবে

পাকিস্তানে বাংলাভাষীর সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিতে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে শুরু হয় রাষ্ট্রভাষার দাবিতে প্রতিরোধ আন্দোলন তথা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন।

ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ আন্দোলনের সূচনালগ্ন (১৯৪৭) থেকে প্রতিটি পর্বে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। বর্তমান প্রবন্ধে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তথা পটভূমিতে না গিয়ে এই আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদান কতটুকু তা তুলে ধরা হয়েছে।

চিকিৎসাশিক্ষা, কারিগরি অন্য যেকোনো শিক্ষার চেয়ে ব্যতিক্রম। চিকিৎসাশিক্ষার মূল বিষয় হলো মানুষের সুস্থতা তথা অসুস্থ মানুষকে সুচিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করা ও জীবন রক্ষা করা। স্বাভাবিকভাবেই তাত্ত্বিক শিক্ষার চেয়ে হাতে-কলমে ব্যবহারিক শিক্ষা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তাত্ত্বিক পড়াশোনার পাশাপাশি রোগীর পাশে বসে রোগ-নির্ণয়, ঔষধ প্রয়োগ, এর কার্যকারিতাসহ সবকিছু পর্যবেক্ষণ তথা ক্লিনিক্যাল শিক্ষার ওপর সুচিকিৎসক হওয়া নির্ভর করে। প্রতিটি ক্লাশে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি প্রয়োজন হয়। অন্যথায় সুচিকিৎসক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কমে যায়। সুচিকিৎসক হতে না পারলে কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে ক্যারিয়ার গড়াও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে চিকিৎসাশিক্ষার মতো জটিল বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পড়ার বাইরে অন্য কিছুতে সময় দেওয়া দুরূহ হয়। আন্দোলনে জড়িত হলে নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে পারে জেনেও মেডিকেল কলেজের অনেক শিক্ষার্থী দেশাত্মবোধের নৈতিক কর্তব্যবোধ থেকে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সুসংগঠিত হয়ে যোগদান করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সে সময়ের (১৯৫২) কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ডা. শরফুদ্দিন আহমেদ (শিক্ষাবর্ষ ১৯৪৮-৪৯, ব্যাচ K-7) বলেন, ''মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তাদের মনোভাবটি এ রকম ছিল যে, শিক্ষাজীবন শেষে চাকুরি না করে প্রাইভেট প্রাকটিস করে জীবন নির্বাহ করা যাবে'' (ALUMNI DIRECTORY DHAKA MEDICAL COLLEGE, PP-13-23 এবং রফিক, ২০০৩, পৃ. ৮০)।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে পূর্ববঙ্গে ভাষাবিষয়ক বিক্ষোভের সূচনা হয়। ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্বে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদান সম্পর্কে এ কলেজের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী মির্জা মাজহারুল ইসলাম বলেন, ''১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাষ্ট্রীয় কাজে উর্দু ও উর্দু ভাষাভাষীদের দাপট শুরু হয়। ইংরেজ আমলের পোস্ট কার্ড ইনভেলাপ হতে বাংলা উঠিয়ে লেখা হয়, তখনই আমাদের মনে ভাষার প্রশ্নটি উদয় হয় এবং এর প্রতিবাদের জন্য তৈরি হই'' (লিটু, ২০১৮, পৃ. ৩৩-৩৪)। এ বছরের ডিসেম্বর মাসে ক্ষমতাসীন সরকারের সহযোগিতায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে পুরনো ঢাকার উর্দুভাষী অধিবাসীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজের অস্থায়ী পলাশী ব্যারাকের ছাত্রাবাসের সামনে মিছিল নিয়ে আসলে কলেজের শিক্ষার্থীরা তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে এবং তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় (*দৈনিক আজাদ*, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭)। এর ফলে কলেজের অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়। ভাষার প্রশ্নে প্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ-সংগ্রামে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা সাহসের সাথে অংশগ্রহণ করে। এ ব্যাপারে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ডা. সাঈদ হায়দার বলেন:

> ... মুহূর্তে প্রতিরোধ এলো, মিছিলের অগ্রগতিকে বাধা দিতে বেরিয়ে এলো মেডিকেল ছাত্ররা, শুরু হলো খণ্ড যুদ্ধ। .... মেডিকেল শিক্ষার্থীদের অনেকেই সেদিন আহত হয়েছিল, কেটে ছিঁড়ে গিয়েছিল

> তাঁদের অঙ্গ প্রতঙ্গ, কিন্তু দৃঢ় মনোবল নিয়ে তারা সেদিন ভাষা ও সংস্কৃতির শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিল, দুর্জয় সাহস আর ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ নিয়ে... (হায়দার, ১৯৯৬, পৃ. ৯৯)।

১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হলেও তা ১৯৪৮ সালে সুনির্দিষ্ট আন্দোলনের রূপ নেয়। একই বছরের (১৯৪৮) ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি, উর্দুর সাথে বাংলাকে গণপরিষদের তৃতীয় ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা মুসলিম লীগের সদস্যদের বিরোধিতার কারণে বাতিল হয়ে যায়। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ফেব্রুয়ারি মাসের (২৬, ২৮, ২৯) বিভিন্ন সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হয় ও ধর্মঘট পালিত হয়। উক্ত সভা ও ধর্মঘটে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বেশকিছু শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তারা ক্লাস বর্জন করে রাস্তায় নেমে এসে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেয় এবং পথসভায় বক্তব্য রাখে (লিটু, ২০১৮, পৃ. ৮৫)।

একই বছরের (১৯৪৮) ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে তমদ্দুন মজলিশ ও মুসলিম ছাত্রলীগের এক যৌথসভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। এ পরিষদে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে কলেজের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী মীর্জা মাজহারুল ইসলাম অন্তর্ভুক্ত হন। শুরুর দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিজস্ব কোনো ছাত্রাবাস না থাকায় তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলে থাকতে হয়েছে। মেডিকেল কলেজে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল। তিনি খেলাধুলা, লেখাপড়া ও রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। সে কারণেই মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি ছাড়াও এ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বদরুল আলম, আবু সিদ্দিক মিয়া, আবদুল মান্নান, আবদুল হাই প্রমুখ। তাঁরা আন্দোলনের শুরুর দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আন্দোলন সংগঠনে তাঁকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন (লিটু, ২০১৮, পৃ. ৮৩)। ১৯৪৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারির সভায় সরকারের ভাষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে ১১ই মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘট পালনের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা সফল করার জন্য ঢাকার ছাত্রনেতারা নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরাও যথেষ্ট সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে। অলি আহাদ প্রমুখ নেতার সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জসিমুল হক, আবু সিদ্দিক মিয়া, এম. আই. চৌধুরী, মোঃ আলী আসগর প্রমুখ হাইকোর্ট ও সেক্রেটারিয়েটের প্রথম গেটের সামনে অবস্থান নেয়। অন্যান্যরা পলাশী ও নীলক্ষেত ব্যারাক, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ অঞ্চলে পিকেটিং করে (হায়দার, ১৯৯৬, পৃ. ২৬৯)।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা কেবল ভাষা আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেনি বরং উর্দু শিক্ষার পক্ষে যারা প্রচারণা করছিল, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দুভাষী অধ্যাপক ড. সাদানির বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বেতারে আপত্তিকর বক্তৃতা দেবার প্রতিবাদে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা তাঁর পদচ্যুতির দাবি জানানোর জন্য সভার আয়োজন করে (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১২৬)। পরবর্তীকালে এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার বিরুদ্ধে অন্যান্য শিক্ষার্থীর মতো ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাও প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে।

১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে মেডিকেল কলেজের মাহফুজ হোসেন, মীর্জা মাজহারুল ইসলাম, আহমেদ ফজলুল মতিন, আবু ছিদ্দিক, আবদুল মান্নানসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও

প্রতিবাদ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা ২২ ও ২৩শে মার্চ ছাত্র-সমাবেশ করে। মূলত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তৃতা শুনতে যাওয়া শিক্ষার্থীরাই ব্যারাকের অন্য সহপাঠীদের সাথে নিয়ে পরবর্তী একুশের আন্দোলন গড়ে তোলে (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১২৮)।

১৯৪৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিশেষ কোনো আন্দোলন না হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রসমাজ ভাষার বিষয়ে প্রস্তুত ছিল। বিভিন্ন সময়ে তারা তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের যেসব ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলে থাকত তাদের উদ্যোগে এই হল থেকে উর্দুভাষী শিক্ষার্থীদের প্রতিহত করার চেষ্টা হয় এবং এ কাজে তারা সফল হন। এ সময়ের মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপরতা নিয়ে আ. জা. ম. তকীয়ুউল্লাহ বলেন:

> ... ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনসহ ছাত্র আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ পর্যন্ত পুরো আন্দোলনকে প্রাণবন্ত রাখতে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৯-১৯৫১ সালের আন্দোলনে মেডিকেল কলেজের ছাত্র আবদুল হাইসহ অনেকেই গ্রেপ্তার হন এবং তাদের কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তৎকালীন সময়ের মেডিকেল কলেজের ছাত্র মোবারকেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল (লিটু, ২০১৮, পৃ. ১২৬)।

এ সময়ের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষা চেতনা এত গভীর ছিল যে, তারা উর্দুভাষা সংশ্লিষ্ট কোনো কিছুকে ছাড় দিতেন না। ১৯৫১ সালের আগস্ট মাসে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল টি আহমেদ (১৯৪৮-১৯৫১) কলেজে 'নাজমা ও নুরী' নামে একটি উর্দু নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হন এবং নাটকটি মঞ্চস্থ করতে বাধা দেন। ফলে পুরো আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায় (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১২৯)। ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরাও প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে।

একই বছরের ৩১শে জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরিতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, তমদ্দুন মজলিস, ইসলামি ব্রাদারহুড, যুবলীগ ইত্যাদি সংগঠনের প্রতিনিধি ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা মেডিকেল স্কুল, জগন্নাথ কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রনেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন শরফুদ্দিন আহমেদ, আহমদ রফিক, মোঃ আলী আসগর, মোজাম্মেল আবদুল সালাম প্রমুখ। এ আলোচনা সভায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ বা 'All Parties Committee of Action' গঠিত হয় (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩০)। প্রতিটি সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এ পরিষদ গঠন করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে গোলাম মাওলাকে সদস্য মনোনীত করা হয়। এই মনোনয়নে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দুজন করে প্রতিনিধি নেওয়া হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে শুধু সহ-সভাপতি হিসাবে একজন প্রতিনিধি গোলাম মাওলাকে নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে এই সভায় উপস্থিত ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী আহমদ রফিক বলেন:

> ...হয়তো উপস্থিত রাজনীতিক ও ছাত্রনেতারা ভেবেছিলেন মেডিকেল কলেজের মতো কারিগরি শিক্ষায়তনের তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্ররা তাদের কর্মব্যস্ততার মধ্যে আন্দোলনে কতটাই বা সময় সহায়তা দিতে পারবেন। কিন্তু এই ধারণা যে সর্বতোভাবে ভুল একুশের আন্দোলনে তার প্রমাণ মিলে ছিল... (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১২৯)।

ভাষা আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বকে ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন স্বীকার করেন। ১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে ছাত্রসভা হয়, সেখানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অনেক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। উক্ত সভায় একুশ ফেব্রুয়ারিতে দেশব্যাপী হরতাল, বিক্ষোভ, সভা ও মিছিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ তা সমর্থন করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করে যে, পুরনো ঢাকার উর্দুভাষীদের ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে না পারলে এ আন্দোলনকে সার্থক ও সফল করা কষ্টকর হবে। তাই ১৯শে ফেব্রুয়ারি কলেজ ইউনিয়নের সহ-সভাপতি গোলাম মাওলার পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক শরফুদ্দিন কাদের সর্দারের বাসায় গিয়ে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে তাঁর সমর্থন আদায় করেন। পুরনো ঢাকার জনগণ; বিশেষ করে কাদের সর্দার যদি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে এ সিদ্ধান্ত না দিতেন, তাহলে তাদের পক্ষে আন্দোলনে যাওয়া খুবই কঠিন ছিল (লিটু, ২০১৮, পৃ. ১৮৯)। সে সময়ের সাধারণ সম্পাদক শরফুদ্দিন আহমেদ তা উল্লেখ করেন। তারা এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। কারণ ঢাকার প্রভাবশালী উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী যখন বাংলাকে সমর্থন করবে, তখন পূর্ববাংলার জনগণের ওপর মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা পরিবর্তন করতে শাসকশ্রেণি অনেক বেশি চাপে পড়বে।

বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ও বেশকিছু প্রাণের বিনিময়ে মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা শুধু সভা ও মিছিলে অংশগ্রহণ করে কর্তব্য শেষ করেননি। তারা মেডিকেল ব্যারাকের শিক্ষার্থীদের একুশে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি বাস্তাবায়ন করতে আহ্বান জানান। তাই একুশে ফেব্রুয়ারিকে সফল করে তুলতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হলের মতো মেডিকেল ব্যারাকেও ব্যস্ততা বেড়ে যায়। শিক্ষার্থীরা পোস্টার লেখা, চাঁদা তোলা, ইশতাহার ছাপার জন্য প্রেসে যাওয়া ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকে। মেডিকেল কলেজের যেসব শিক্ষার্থী পোস্টার লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা হলেন, জিয়া হাসান, নুরুল ইসলাম, বদরুল আলম, ফজলে রাব্বি, জাকির হোসেন, মশাররফুর রহমান প্রমুখ (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩১)।

১৯৫২ সালে ২০শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপরতা বন্ধ করার জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে। এ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য হল ও হোস্টেলের শিক্ষার্থীদের মতো মেডিকেল ব্যারাকের শিক্ষার্থীরাও নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এদিন মেডিকেল ব্যারাকের এক ছাত্র-সমাবেশে আবুল হাশেম, আলিম চৌধুরী, মনজুর হোসেন প্রমুখ শিক্ষার্থী বক্তৃতা দেন। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ২০শে ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মেডিকেল ব্যারাকের শিক্ষার্থী ডা. সাঈদ হায়দার বলেন, বায়ান্নর ২০শে ফেব্রুয়ারি একটি উত্তেজনাপূর্ণ বিকেল। মেডিকেল ছাত্রাবাসের প্রতিটি ছাত্রকর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত থেকে শহরে সরকার আরোপিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে ছিল (হায়দার, ১৯৯৬, পৃ. ২৭৭)।

১৪৪ ধারা জারির পর সার্বিক পরিস্থিতি ও পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করার জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ৯৪, নবাবপুর রোড, আওয়ামী লীগের অফিসে প্রধান নেতা আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কবির উদ্দিন আহমেদ বলেন, এতৎসত্ত্বেও উক্ত সভার অধিকাংশ সদস্যই সরকারি দমন-নীতিকে মেনে নেওয়ার পক্ষে মন্তব্য করেন। অবশেষে ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (ইসলাম, ১৯৮৬, পৃ. ২৭)। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভায় ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে যারা ভোট দিয়েছিলেন গাজীউল হক তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন: অলি আহাদ, আবদুল মতিন, ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী গোলাম মওলা। মোহাম্মদ তোয়াহা ভোটদানে বিরত থাকেন। বাকি ১১ জন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিপক্ষে ভোট দেন (ইসলাম, ১৯৮৬, পৃ. ২৭)। উক্ত সভায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি গোলাম মাওলা অংশগ্রহণ করেন। মেডিকেল ব্যারাকের সচেতন শিক্ষার্থীরা ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। অন্যদিকে মেডিকেল ব্যারাকের শিক্ষার্থী আহমদ রফিককে সর্বদলীয় পরিষদের ওপর নজর এবং যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে গিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থী ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে ছিল (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩২)।

এ রকম অবস্থায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে পুলিশ বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং তথা বর্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে অবস্থান নিতে থাকে (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩৩)। উল্লেখ্য, এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ, লাইব্রেরি, প্রশাসনিক ভবন, শ্রেণিকক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক অংশে ছিল, অন্য অংশ ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধীনে ছিল; কারণ তখনও ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিজস্ব ভবন ছিল না। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশটি ১০ লক্ষ রুপির বিনিময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ কারণেই মেডিকেল কলেজ থাকা সত্ত্বেও এ এলাকাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর বলা হতো। তাছাড়া মেডিকেল কলেজ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ফ্যাকাল্টির অধীনে। ১৯৫৫ সালে হাসপাতালের পাশেই মেডিকেল কলেজের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়।

শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে কলা ভবনের সামনে হাজির হতে থাকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা সবাই হাসপাতাল প্রাঙ্গণের পূর্বে আমতলা ও মধুর ক্যান্টিনের সামনে হাজির হয়। মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ কলেজের অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে মিলিত হয়। আমতলার সভার বিবরণ অনেকেরই জানা। সেই বিবরণে না গিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের ওই সভায় অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। কলেজের ৪৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী মতিয়ার রহমান এ দিনটির অভিজ্ঞতার কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন:

> আমতলার মিটিং এ ছিলাম, এখান থেকে ১০ জন করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে যেসব শিক্ষার্থী বের হচ্ছিল তার এক ব্যাচে আমিও ছিলাম। ভাগ্যক্রমে পুলিশের বেষ্টনী থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে মেডিকেল কলেজের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩৫)।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শিক্ষার্থীরা পুলিশ কর্ডন ভেঙে মেডিকেল ব্যারাকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে লাঠিচার্জ করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং পুরো এলাকার চেহারা পাল্টে যেতে থাকে। আমতলা ও মধুর ক্যান্টিনে দু-একজন শিক্ষার্থী থাকলেও মেডিকেল ব্যারাক প্রাঙ্গণ ভরে যায়। এ সময় ব্যারাক প্রাঙ্গণেও স্লোগান চলতে থাকে এবং এসেম্বলি ভবন ঘেরাও করে এমএলএ-দের রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করতে চেষ্টা করা হয়। এরই মধ্যে পুলিশ ব্যারাকের সামনে অবস্থান নিলে নিরস্ত্র শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। ২১শে ফেব্রুয়ারির দুপুরের দিকে ব্যারাক প্রাঙ্গণে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি ছিল। ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আহমদ রফিক জানান, 'তারাই তৎপর ছিল সবার চেয়ে বেশি' (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩৩)। এ সময় মেডিকেল কলেজের বেশকিছু শিক্ষার্থী মানিকগঞ্জের এমএলএ আওলাদ হোসেনসহ কয়েকজন এমএলএ-কে ব্যারাক-প্রাঙ্গণের ছয় নম্বর ছাউনিতে নিয়ে আসেন এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে পরিষদে প্রস্তাব আনার অঙ্গীকার আদায় করেন (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩৬)।

এরকম বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ৩:১০ থেকে ৩:৩০ মিনিটের দিকে তৎকালীন অবাঙালি জেলা প্রশাসক এ এইচ কোরেশীর নির্দেশে পুলিশ মেডিকেল কলেজের ব্যারাকের সামনে সমবেত শিক্ষার্থীদের ওপর দু'দফায় ২৭ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে কয়েকজন শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ শহিদ হন। এটাই ছিল পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে শিক্ষার্থীদের ওপর প্রথম গুলিবর্ষণ। এ সময় মেডিকেল ব্যারাককে কেন্দ্র করে ভাষার লড়াই ছিল যেমন সাহসী, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত। মেডিকেল ব্যারাক পরিণত হয় ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে। গুলিবর্ষণে শহিদ হবার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণ যুক্ত হতে থাকে। তাদের সংখ্যাই ছিল বেশি। ভাষা আন্দোলনের ফলে গণ-আন্দোলনের যে প্রবলতা সূচিত হয়েছিল, তা সরকারের প্রশাসনিক ভিত দুর্বল করে দেয়। মেডিকেল ব্যারাক প্রাঙ্গণের এই কর্মতৎপরতায় মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য ছিল। এ সময় পুলিশের গুলিতে ব্যারাক প্রাঙ্গণে শহিদদের মধ্যে ছিলেন মাথায় গুলিবিদ্ধ রফিকউদ্দিন, উরুতে গুলিবিদ্ধ আবুল বরকত, তলপেটে গুলিবিদ্ধ আবদুল জব্বার। শহিদ রফিক উদ্দিনের মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা ঢাকা মেডিকেল কলেজের তৎকালীন তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ও ১৮ নম্বর ছাউনির ১০ নম্বর কক্ষের বাসিন্দা হুমায়ূন কবির স্বচক্ষে দেখেন এবং তাঁকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যান (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩৮)। একই ঘটনা মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের আরেক শিক্ষার্থী মোশাররুফ প্রত্যক্ষ করেন এবং শহিদ রফিক উদ্দিনের মাথার মগজটি তিনি দুই হাতে তুলে নেন (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩৮)।

গুলিবর্ষণের ঘটনা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। *Morning News* ব্যতিত সবকয়টি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ঘটনার বিবরণ সঠিকভাবে প্রকাশ করে। *Morning News* পত্রিকা সম্প্রদায়িকতামূলক সংবাদ 'Dhutees Roaming Dhaka Street' শিরোনামে প্রকাশ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী আহমেদ রফিক নিজের গবেষণায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। তাঁর মতে, এ পত্রিকা বরাবরই মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, সাম্প্রাদায়িক মানসিকতার সংবাদ প্রচার করে (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৫৩)। অন্যদিকে মওলানা আকরাম খাঁর মালিকানাধীন মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত *দৈনিক আজাদ* তার রক্ষণশীলতা থেকে বেরিয়ে এসে 'তদন্ত চাই' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে (*দৈনিক আজাদ*, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)। *সাপ্তাহিক সৈনিক* 'শহীদের তাজা রক্তে ঢাকার রাজপথ রনজিত' এবং 'মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ছাত্র সমাবেশে গুলিবর্ষণ' শিরোনামে আবেগঘন সংবাদ প্রচার করে (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৫৩)।

মেডিকেল ব্যারাকের শিক্ষার্থীরা আহত ও নিহতদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আহতদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া এবং শহিদদের লাশ মর্গে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করেন কলেজের শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, এমনকি ওয়ার্ডবয়সহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী। মেডিকেল কলেজের কোনো শিক্ষার্থী শহিদ না হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও ব্যারাক প্রাঙ্গণ আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। আন্দোলনের নেতৃত্বও তাদের ওপর এসে পড়ে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি দেওয়া, প্রচারকার্য পরিচালনা, পরস্পর যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ আন্দোলনের সার্বিক সমন্বয় সাধনের কাজটি সম্পন্ন করে। এ প্রসঙ্গে ভাষাসৈনিক ও ১৯৫০-৫২ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল মতিন বলেন:

> ভাষা আন্দোলনের গুলিবর্ষণের পর ঢাকা শহর ও সমগ্র দেশের শিক্ষার্থীদের ও তাদের সমর্থক জনগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেলেও সে সময় আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ তথা কলেজের বাঁশের ব্যারাকের ছাত্রাবাসে। তা যদি না হতো তাহলে ভাষা আন্দোলন এত সুশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্ত না হতে পারতো। গুলি চালনার পরপরই মেডিকেল হোস্টেলের আমগাছগুলিতে বাঁধা মাইকের হর্ন থেকে প্রচারই জানিয়ে দিয়েছিল শিক্ষার্থীদের ওপর নির্মম, বর্বর ও আকস্মিক গুলিবর্ষণের খবর। তাদের দেখাদেখি পরে ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ্ হল এবং আরো কিছু জায়গায় মাইক বেঁধে প্রচারের পদ্ধতি চালু হয়েছিল (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১০)।

মেডিকেল কলেজের মাইকের মাধ্যমে গুলিবর্ষণের খবর প্রচারিত হলে তা দ্রুত ঢাকা শহরবাসী জনগণের কানে পৌঁছায়। কলকাতার *সাপ্তাহিক মতামত* ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ পত্রিকার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে রয়েছে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের প্রতিবাদ এবং মেডিকেল হোস্টেলের মাইকে প্রচারণার কথা (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৫৪)। ফলে ছাত্রাবাস ও ইমার্জেন্সিতে সাধারণ মানুষের ঢল নামে। সাধারণ মানুষের এই উপস্থিতি দেখে কয়েকজন শিক্ষার্থী ভাষাসৈনিক আবদুল মতিনকে ২২শে ফেব্রুয়ারি জানাজা প্রদানের কর্মসূচি দিতে আহ্বান জানান। ফলে ভাষা আন্দোলন মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে ছাত্রাবাস, নীলক্ষেত, পলাশী ব্যারাক, পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জ তথা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৫৪)।

গুলিবর্ষণের পর আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণের জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারি রাতে মেডিকেল কলেজ ব্যারাকে (হোস্টেল) সহ-সভাপতি গোলাম মাওলাকে আহ্বায়ক করে একটি নতুন সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারির সর্বদলীয় সভার সিদ্ধান্ত ছিল শিক্ষার্থীদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সর্বদলীয় পরিষদ বিলুপ্ত হবে। সেজন্যই নতুন আহ্বায়ক মনোনয়ন করা হয়। কিন্তু নতুন আহ্বায়ক (গোলাম মাওলা) মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও নতুন সদস্য নিয়ে নতুন পরিষদ গঠন করা হয়নি। তাই পুরনো সদস্যদের অনেকে আন্দোলনের দ্বিতীয় দিন থেকে যাওয়া-আসা শুরু করে। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অনুপস্থিত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা (রফিক, ২০১৭, পৃ. ১৪৫-১৪৬)।

পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনা আন্দোলনের সব কৌশল পাল্টে দেয়। কারণ এ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে তা সকল শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার টানে, অন্তত মেডিকেল হোস্টেলের প্রাঙ্গণের ঘটনাবলিতে, হোস্টেল প্রাঙ্গণে ও হাসপাতালে নেতাদের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। আবুল হাশিমের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা

সংগ্রাম পরিষদ' তখন প্রায় বিলুপ্ত। গুলিবর্ষণের ঘটনায় সর্বসাধারণের ব্যাপক প্রতিরোধ-আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে রাখতে দৃঢ় সাংগঠনিক কাঠামো প্রয়োজন, যাতে আন্দোলন বিশৃঙ্খলভাবে শেষ না হয়। তাই মেডিকেল হোস্টেলে ২১শে ফেব্রুয়ারি রাতে ছাত্র-যুব নেতাদের মধ্যে জরুরি বৈঠক হয়। সর্বসম্মতিক্রমে মেডিকেল কলেজ ছাত্র-সংসদের ভি পি গোলাম মাওলাকে সর্বদলীয় পরিষদের অস্থায়ী আহ্বায়ক মনোনীত করে পরদিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়। পরদিন (২২শে ফেব্রুয়ারি) সকালে হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহিদদের জানাজা অনুষ্ঠানের পর তাঁদের লাশ নিয়ে ঢাকা শহরের রাজপথে মিছিল, শোক দিবস পালন, বাড়িতে বাড়িতে কালো পতাকা উত্তোলন, শোকচিহ্ন হিসেবে প্রত্যেকের বুকে কালো ব্যাজ কিংবা বাহুতে কালো ফিতা ধারণ, দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান, ইশতেহার ছাপা ও বিতরণ– ইত্যাদি ছিল সেদিনের কর্মসূচি (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৫৪)।

সংগ্রাম পরিষদ গঠনের পর আন্দোলনে গতিসঞ্চার হয়। মেডিকেল কলেজের সকলপন্থি শিক্ষার্থী একতাবদ্ধ হয়ে সম্মিলিতভাবে একুশের আন্দোলনকে সার্থক করে তোলে, কেননা শহিদদের মৃতদেহ, কবর ও পরিচয় এ কলেজের শিক্ষার্থীদের দ্বারা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। দু'জন মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থী ভাষা-শহিদদের মৃতদেহ শনাক্ত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা হলেন বামপন্থি ছাত্রনেতা খোন্দকার আলমগীর এবং আমীর আহসান। শহিদদের মৃতদেহ লুকিয়ে রাখা সত্ত্বেও সামরিক বাহিনীর লোকজন হাসপাতাল ঘেরাও করে লাশগুলো নিয়ে যায়। সকালে কারফিউ'র সময় পার হওয়ার সাথে সাথে উল্লিখিত দুই শিক্ষার্থী আজিমপুর কবরস্থানে চলে যান। শহিদদের রক্তমাখা কাপড় ও ব্যান্ডেজ ইত্যাদি কবরস্থানের একটি ঘর থেকে উদ্ধার করেন এবং কবরগুলো চিহ্নিতকরণ করেন। এ খবর সলিমুল্লাহ হলের মাইকে ঘোষণা করা হলে রক্তমাখা ব্যান্ডেজ ও কাপড়ের টুকরো নিয়ে এক শোভাযাত্রা হয়। শোভাযাত্রায় শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণসহ বহু সরকারি কর্মচারী অংশগ্রহণ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী এ মিছিলে যোগ দেয়। এদের মধ্যে যেমন ছিল রাজনীতি-সচেতন শিক্ষার্থী, তেমনি ছিল রাজনীতিতে অনাগ্রহী পড়াশোনায় একনিষ্ঠ শিক্ষার্থী ও সাধারণ শিক্ষার্থী (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৫০)। এ প্রসঙ্গে ভাষাসৈনিক এম আর আখতার মুকুল লিখেছেন:

> মেডিকেল কলেজের দু'জন ছাত্র দুঃসাহসিক কাজ করে বসলো। কারফিউর মধ্যে এরা সৈন্যদল চলে যাবার পর এই দুই জন ছাত্র শহিদদের কবরগুলো চিহ্নিত করে এলো। এই জন্যই পরবর্তীকালে ছাত্রসমাজ প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আজিমপুর গোরস্থানে এই কবরগুলো জিয়ারত ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে সক্ষম হচ্ছেন (মুকুল, ১৯৮৭, পৃ. ৩১)।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজে একটি ব্লাড-ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ভাষা আন্দোলনে যারা আহত হয়েছিল, তাদের চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের জন্য প্রচুর রক্তের প্রয়োজন ছিল কিন্তু হাসপাতালের কোথাও রক্ত ছিল না। রক্তের প্রয়োজন মেটাতে রক্ত সংগ্রহের জন্য ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় রক্ত সংগ্রহ অভিযান ও ব্লাড-ব্যাংক স্থাপন করা হয়। এর মধ্য দিয়েই প্রথম ব্লাড-ব্যাংক স্থাপনের চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয় এবং বিনামূল্যে রক্ত প্রদানের ব্যবস্থা চালু হয় (লিটু, ২০১৮, পৃ. ৯৪)। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রক্তদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। *সাপ্তাহিক সৈনিক* জানায়, ''আজকের হত্যাকাণ্ডে আহত বন্ধুরা রক্তের অভাবে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মরতে বসেছে। আপনি দয়া করে ব্লাড-ব্যাংকে রক্ত দান করে বাঁচান'' (লিটু, ২০১৮, পৃ. ৯৪)।

ভাষাশহিদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য শহিদ মিনার নির্মাণের কথা চিন্তা করা হয়। মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং 'শহিদ স্মৃতি অমর হোক'– এ স্লোগানের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হয় ঢাকায় প্রথম শহিদ মিনার এবং মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা এর নাম দেয় 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ'। এর পরিকল্পনা ও নির্মাণ মেডিকেল হোস্টেলের শিক্ষার্থীদের যৌথ চিন্তা ও ঐক্যবদ্ধ শ্রমের ফসল। ২৩শে ফেব্রুয়ারি সকালে মেডিকেল হোস্টেলে কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী এই পরিকল্পনা করে এবং রাতে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করে। এ স্মৃতিস্তম্ভের নকশা আঁকেন মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী বদরুল আলম। 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ' ফলকটিও তাঁরই হাতে লেখা (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৬৭)।

পরিশেষে বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেল পর্যন্ত অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদানও উল্লেখ করার মতো। মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীগণ তাঁদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পড়াশোনার পাশাপাশি দেশ, জাতি ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা থেকে ভাষা আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরুর সময় থেকে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য আবুল কাশেমের নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিস' নামে যে সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, তার সাথে এ কলেজের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা ছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সফল করতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদান ছিল উল্লেখ করার মতো। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপরতা বন্ধের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করলে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের অধিকাংশ সদস্য মেনে নেওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত দিলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের সচেতন শিক্ষার্থীসহ অন্যরা তা মেনে নেয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এই মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্য এগিয়ে গেলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এরপরেই আন্দোলনের কৌশল পাল্টে যায়। বিশেষ করে ২১শে ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের পরবর্তী সময়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মেডিকেল শিক্ষার্থীরা এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি রাত থেকে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কৃতিত্বের প্রধান দাবিদারও তারা। তাদের এ অবদানের কথা তেমন প্রচার বা স্বীকৃতি না পেলেও ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের কথা স্বীকার করে বলেন:

> ভাষা আন্দোলনের অমূল্য কীর্তি শহিদ মিনারের প্রথম স্মৃতিস্তম্ভ মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের অবদান। ভাষা আন্দোলনের শহীদ এবং আন্দোলনের হাজারো সহকারীদের স্মৃতি অম্লান রাখার জন্য বর্তমান শহীদ মিনারের কাছে ২৩ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজ ছাত্ররা এক রাত্রের মধ্যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে যে কাজটি সম্পন্ন করেছিল তা আজও বাঙালি জাতির কাছে অমর হয়ে আছে। আজ বাংলাদেশের সকল ছাত্র প্রতিষ্ঠানে ভাষা শহীদদের স্মরণে ছাত্ররা ঐ একই প্রকার স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে রেখেছে (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১০-১১)।

তথ্যসূত্র

আলী, মো: শওকত (২০১৩)। *২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস*। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ।

আলী, সৈয়দ মুজতবা (২০০২)। *পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা*। ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড।

ইসলাম, রফিকুল (১৯৮৬)। *শহিদ মিনার*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

উমর, বদরুদ্দীন (২০১৭)। *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। ঢাকা: বাতিঘর।

খান, এম. সাইদুর রহমান (২০১৬)। *অমর একুশের বিশ্বায়ন যেভাবে হলো*। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশনা।

মতিন, আবদুল (১৯৮৬)। *ভাষা ও একুশের আন্দোলন*। ঢাকা: নন্দন প্রকাশনা।

মতিন, আবদুল (২০১৩)। *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: মুক্তচিন্তা প্রকাশনা।

মাহমুদ, হায়াৎ (১৯৮৯)। *অমর একুশে*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

মাহমুদ, হায়াৎ (২০১৬)। *বাংলা ভাষা এবং ভাষা আন্দোলনে প্রথম শহীদ: আব্বাস উদ্দিন আহমেদ ভূমিকা*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সেল একাডেমী।

মুকুল, এম. আর আখতার (১৯৮৭)। *বায়ান্নোর জবানবন্দী*। ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স।

রফিক, আহমদ (২০০৩)। *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ ১৯৪৭-১৯৭১*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

রফিক, আহমদ (২০১৭)। *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*। ঢাকা: অনিন্দ প্রকাশ।

রশীদ, রফিকুর (২০১৪)। *আমাদের ভাষা আন্দোলন: কিশোর ইতিহাস*। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

লিটু, মনিলাল আইচ ও মাহবুব, এম. আর. (২০১৮)। *ঢাকা মেডিকেল কলেজ: সেবা সংগ্রাম ঐতিহ্য*। ঢাকা: গৌরব প্রকাশন।

সবুজ, শাহ কামাল (২০১৬)। *ভাষা শহীদ এবং আমাদের দায়*। ঢাকা: জনতা প্রকাশ।

হায়দার, সাঈদ (১৯৯৬)। *পিছু ফিরে দেখা*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

হাসান, খন্দকার মাহমুদুল (২০০২)। *ভাষা ও বর্ণমালার ইতিহাস*। ঢাকা: ঐতিহ্য।

পত্রিকা

দৈনিক আজাদ, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭।

দৈনিক আজাদ, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

দৈনিক আজাদ, ১৭ই এপ্রিল ১৯৬৯।

সাক্ষাৎকার

রফিক, আহমদ (২০২২)। (ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র) সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: চাঁদ সুলতানা কাওছার।

ফাইল

ALUMNI DIRECTORY DHAKA MEDICAL COLLEGE, Dhaka Medical College Alumni Trust.